بسم الله الرحمن الرحيم

লণ্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ০৩ অক্টোবর ২০০৩, মোতাবেক ০৩ ইখা, ১৩৮২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন,

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُو*نِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ * يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ* (সূরা আল্ আ'রাফ: ৩০-৩২)

{অর্থ: তুমি বল, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দিয়েছেন'। আর (এ আদেশও দিয়েছেন) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজেদের মনোযোগ (আল্লাহ্‌র প্রতি) নিবদ্ধ কর এবং আনুগত্যকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাক। তিনি যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবে তোমরা (মৃত্যুর পর তাঁর দিকেই) প্রত্যাবর্তন করবে। একদলকে তিনি হিদায়াত দিয়েছেন এবং আরেকটি দলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত করেছেন। নিশ্চয় তারাই আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শয়তানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে আর তারা নিজেদের হিদায়াতপ্রাপ্ত মনে করে। হে আদমসন্তান! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজেদেরকে (তাক্বওয়ার পোশাকে) সুসজ্জিত কর এবং আহার কর ও পান কর, তবে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।}

ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ বরং এই জুমুআর খুতবার মাধ্যমেই এই মসজিদ যার নাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) **'বাইতুল ফুতুহ্'** রেখেছিলেন এর উদ্বোধন করা হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমি বলে দিচ্ছি।

১৯৯৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) (এই মসজিদের) তাহ্‌রীক করেছিলেন আর প্রথমদিকে বিশ্ব জামাতে আহমদীয়াকে এই মসজিদের জন্য পাঁচ মিলিয়ন পাউণ্ড তহবিল সংগ্রহের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপর ১৯৯৬ সালে প্রায় সোয়া দুই মিলিয়ন বা বাইশ লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড খরচ করে এখানে পাঁচ একর জমি ক্রয় করা হয়। ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন যাতে কাদিয়ানের বাইতুল ফিক্‌র এর ইঁট ব্যবহার করা হয়। এ মুহূর্তে স্বভাবতই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র স্মৃতি আমাদের আবেগাপ্লুত করছে কেননা, তিনি যে প্রকল্প আরম্ভ করেছিলেন তা যদি নিজ হাতেই উদ্বোধন করতেন (তাহলে কত ভালো হত)। কিন্তু যাহোক, ঐশী নিয়তির ওপর আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং আমরা তাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু একইসাথে হুযূর (রাহে.)'র জন্য আমরা দোয়ার প্রেরণা বোধ করি আর দোয়া করতে থাকা উচিত।

এরপর ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হুযূর (রাহে.) এক্ষেত্রে কিছুটা প্রশাসনিক পরিবর্তন আনেন এবং এই মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আরো পাঁচ মিলিয়ন অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড তহবীল সংগ্রহের আহ্বান জানান। যুক্তরাজ্যের আমীর মোহতরম রফিক আহমদ হায়াত সাহেবের হাতে এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির কো-অর্ডিনেটর ছিলেন মোহতরম নাসের খান সাহেব। তিনি অত্যন্ত কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে

রূপান্তরিত করেছেন অর্থাৎ যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা সফলভাবে সম্পন্ন করেন, মাশাআল্লাহ্। আর তার সাথে আরো কয়েকজন বন্ধু ছিলেন যারা অহোরাত্র পরিশ্রম করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আঞ্জুম উসমান সাহেব এবং এছাড়া পুরো টিম ছিল যাদের প্রত্যেকের নাম নেয়া সম্ভব নয়। এজন্য সে সব মানুষ যারা অহোরাত্র পরিশ্রম করে মসজিদটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। সে সব খাদেম এবং স্বেচ্ছাসেবী যারা স্বেচ্ছাসেবা প্রদান করেছেন তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন।

এছাড়া ইংল্যাণ্ডের জামাত ছাড়াও বিশ্বের নিষ্ঠাবান (আহমদী) পুরুষ ও মহিলারা মুক্ত হস্তে এই মসজিদ নির্মাণে আর্থিক কুরবানী করেছেন। শিশু-কিশোররা নিজেদের পকেট খরচ এবং মহিলারা নিজেদের অলঙ্কারাদি দান করে অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করুন। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আর্থিক কুরবানীর পাশাপাশি এই মসজিদ নির্মাণে স্বেচ্ছাসেবারও মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। এতে কাদিয়ান এবং জার্মানির খোদ্দামরা কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এসব সেবা প্রদানকারীকে অপার দানে ভূষিত করুন যারা অর্থ ও সময়ের কুরবানী করেছেন আর তাদের প্রতি স্বীয় কৃপারাজি ও অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণ করতে থাকুন।

এবার এই মসজিদের নকশা বা ডিজাইন সম্পর্কে কিছু বলছি। এর ছাদে ঢাকা বা Covered Area হল, প্রায় ৩৫০০ (সাড়ে তিন হাজার) বর্গমিটার যেখানে আনুমানিক প্রায় চার হাজার মুসল্লী নামায পড়তে পারবে। আর এই মসজিদ কমপ্লেক্স সংলগ্ন প্রশস্ত কয়েকটি হলও রয়েছে, সেগুলো যদি ধরা হয় তবে প্রায় দশ হাজার মানুষ এখানে নামায পড়তে পারবে। এই মসজিদে যে কার্পেট বিছানো হয়েছে তা আমেরিকার এক বন্ধু মুনাওয়ার আহমদ সাহেব অনেক কষ্ট করে সেখান থেকে পাঠিয়েছেন এবং তিনি নিজে পুরো টিম নিয়ে এসে তা বিছিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও উত্তম প্রতিদান দিন।

আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে এর চেয়েও বড় মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করুন কিন্তু এখন পর্যন্ত এটিই ইউরোপের সর্ববৃহৎ মসজিদ। অধিকন্তু একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা এ মসজিদে রয়েছে যা ইসলামের রীতিনীতির আদলে, ইসলামী নির্মাণ শৈলীকে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর রেখে নির্মাণ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের দোয়া হল, এই মসজিদ ইউরোপে ইসলামের শান্তি-সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার অনুপম দৃষ্টান্ত তুলে ধরায় ভূমিকা রাখবে। আর পবিত্রচেতা এমন মানুষ যেন এখানে আসেন যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে সর্বদা ভীত এবং মুত্তাকী, আর পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও তাক্বওয়া বা খোদাভীতি সৃষ্টিকারী হবেন ও খোদার সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করাবেন। এছাড়া আপনারা সেই পুণ্যেরও অংশীদার হোন এবং তার উত্তরাধিকারী হোন যার উল্লেখ হাদীসে এভাবে এসেছে, মাহমুদ বিন লাবীব বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) (তাঁর খিলাফতকালে) মসজিদে নববীর পুনঃনির্মাণ এবং সম্প্রসারণের ইচ্ছা পোষণ করলে কিছু মানুষ সেটি অপছন্দ করেন। তারা চাইতো, এ মসজিদটি যেন মূল রূপেই বিদ্যমান থাকে। এটি শুনে তিনি (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, **'মান বানা মাসজিদাল্ লিল্লাহি বানাল্লাহু লাহু বাইতান ফিল্ জান্নাতি মিসলাহু।'** অর্থাৎ, **'আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে যে মসজিদ নির্মাণ করে তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতে ঠিক তদ্রুপ একটি গৃহ নির্মাণ করবেন'**। **(মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব ফযলু বানাইল্ মাসাজিদি ওয়াল্ হাসসি আলাইহা)**

আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে এই পুণ্যের ভাগীদার করুন। কিন্তু একথা স্মরণ রাখবেন, কেবল মসজিদ নির্মাণ করেই (আমাদের) দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় নি বরং প্রত্যেক

আহমদীকে সর্বদা এ কথা মাথায় রাখা উচিত যে, এ যুগের ইমামকে মেনে তাঁর হাতে বয়আত করে আমরা সেই সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নির্দেশ মানার এবং সেগুলোকে পূর্ণ করার কারণে পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত করার সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু এটি মনে করবেন না যে, আমরা সুসংবাদ পেয়ে গেছি আর আগত মসীহ্‌কে মেনেছি তাই আমাদের দায়িত্ব শেষ. আর এ কারণেই আমরা সেসব পুরস্কারের ভাগী হবো। মোটেও না, বরং আমাদেরকে অবিরাম চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করে এই মসজিদগুলোকে আবাদও করতে হবে আর এখান থেকে প্রেম-প্রীতি, সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্বের বাণীও বিশ্ববাসীকে দিতে হবে। অনবরত দোয়ার মাধ্যমে নিজেদের সংশোধনের প্রতি এবং পরবর্তী প্রজন্মের সংশোধনের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে।

আমি যেক'টি আয়াত পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা সর্বপ্রথম ন্যায়বিচারের আদেশ দিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, বান্দার অধিকার প্রদান সুনিশ্চিত করবে, যার হাত দ্বারা তার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং কল্যাণমণ্ডিত হবে, নিজ বাড়িতে, স্ত্রী সন্তানদের সাথে প্রেম-প্যীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক হবে, পুণ্যকাজের আদেশ দাতা ও মন্দ কাজ থেকে বারণকারী হবে, কারো শত্রুতাও তাকে ন্যায়বিচার করা থেকে বিরত রাখবে না, তাহলে এমন ব্যক্তি যে ন্যায়বিচার ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের উন্নত মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের পুরো মনোযোগ নিবদ্ধ করে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হবে, ধর্মে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকবে, মসজিদে প্রবেশ করতেই আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে তার হৃদয় বিগলিত হবে, ইবাদতের প্রেরণা জাগরুক থাকবে, মসজিদে একবেলা নামায পড়ার পর পরবর্তী ওয়াক্তের অপেক্ষায় থাকবে– তবেই আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানকারী এমন লোকেরা নিশ্চিতরূপে বান্দার প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করবে। অতএব, আল্লাহ্‌র ইবাদত এমন লোকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছে যে, তোমরা বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতিও দৃষ্টি দাও। আর বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ফলে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে একনিষ্ঠ হয়ে গেলে মৃত্যুর পর তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ অবস্থায় উপস্থিত হবে। এর একটি ব্যাখ্যা এভাবেও করা হয় যে, মাতৃগর্ভে শিশু বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর একটি সুস্থ-সবল সন্তানরূপে জন্ম নেয়। যদি কোন স্তরে সঠিকভাবে বৃদ্ধি না ঘটে তাহলে সন্তান নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে আর অনেক সময় ডাক্তার স্বয়ং তা নষ্ট করে ফেলে। একইভাবে মৃত্যুর পর আত্মাও বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করবে, তাই সতর্ক হও! মৃত্যুর পর তোমাদের আত্মা আল্লাহ্ তা'লার সকাশে বিকৃত অবস্থায় যেন উপস্থিত না হয়। এ কারণে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ যাচনা করতে থাকো এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে যাও।

প্রথমত, এ আয়াতে এই নির্দেশ রয়েছে, হে আল্লাহ্‌র রসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলমানরা! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চাও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র খাতিরে ধর্মকে একনিষ্ঠ করতে হবে, অন্যথায় তোমরা ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিপতিত হবে। **দ্বিতীয়ত,** এতে এই ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল যে, এক যুগ অতিক্রম হবার পর মুসলমানরা যদি ইসলামের খাঁটি শিক্ষা ভুলে যায় তাহলে তাদের ইসলাম হবে কেবল নাম সর্বস্ব এবং কিছু মানুষ ছাড়া সিংহভাগ মুসলমানই এই শিক্ষা বিস্মৃত হবে। মহানবী (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আমার পর বরং কিছুকাল পরেই ইসলামের ওপর এক অন্ধকার ও অমানিশার যুগ নেমে আসবে। একেবারে ঘোর অমানিশার যুগ হবে সেটি, যেভাবে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানরাও পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ন্যায় সুপথ ছেড়ে দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। অথচ তারা মনে করে, ইসলামের

ওপর আমাদের চেয়ে বেশি আর কেউ প্রতিষ্ঠিত নয়। এই দাম্ভিক আচরণে তারা এতটাই সীমাতিক্রম করেছে যে, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগের ইমামকে চিনতে তারা কেবল অস্বীকারই করছে না বরং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় আগত ইমামের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপও করছে, বিদ্রুপাত্মকভাবে তাঁর কথা উল্লেখ করে কিংবা নোংরা ভাষা ব্যবহারে চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। অতএব, এমন লোকদের বা এমন দলের বিপথগামী হওয়া অবধারিত। তারা ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিপতিত হয়েছে।

হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেন, **'অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কুরআনের অক্ষরসমূহ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সেই যুগের মসজিদগুলো বাহ্যিকভাবে আড়ম্বরপূর্ণ হবে কিন্তু হিদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিচে বসবাসরত সৃষ্টিকূলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে নৈরাজ্যের উদ্ভব ঘটবে এবং তাদের প্রতিই তা ফিরে যাবে।'** (মিশকাত, কিতাবুল ইলম, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ৩৮; কনযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"ইসলামের প্রকাশ্য ও বাহ্যিক অবস্থায়ও দুর্বলতা এসে গেছে। ইসলামী সাম্রাজ্যের সেই ঐশ্বর্য আর নেই এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকেও 'মুখলিসীনা লাহুদ্ দ্বীন'-এর মাঝে যা শেখানো হয়েছিল এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয় না। অভ্যন্তরীণভাবে ইসলাম অনেক দুর্বল হয়ে গেছে এবং বর্হিশত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত। তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা কুকুর এবং শূকরের চেয়েও নিকৃষ্ট। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, ইসলামকে ধ্বংস করা এবং মুসলমানদের বিনাশ ঘটানো। বর্তমানে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর সাহায্য ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী ছাড়া তাদের মুকাবিলা করা সম্ভব নয়; আর এই উদ্দেশ্যে সাধনের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা স্বহস্তে এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন।"**

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **'ইসলাম যাকে বলা হয় বর্তমানে তাতে অনেক ভিন্নতা এসে গেছে। সবার আচরিত জীবন নোংরামীতে ভরে গেছে এবং 'মুখলিসীনা লাহুদ্ দ্বীন'-এর মধ্যে যে নিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। খোদার প্রতি বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, ভালোবাসা এবং খোদা-ভরসা বিলুপ্ত প্রায়। আর এখন খোদা তা'লা নুতনভাবে সেই শক্তি ও বৈশিষ্ট্যকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'**

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা! কেননা সেই পুনরুজ্জীবিতকারী লোকদের মধ্যে আপনারাও অন্তর্ভুক্ত। তাই মসজিদগুলো আবাদ করাটা আপনাদের গুরুদায়িত্ব হয়ে গেছে।

তিনি (আ.) বলেন, **'বর্তমান যুগে লোক দেখানো, আত্মশ্লাঘা, আত্মঅহংকার, দম্ভ, গর্ব ও অহংবোধ প্রভৃতি হীন অভ্যাস ও হীন বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 'মুখলিসীনা লাহুদ্ দ্বীন' ইত্যাদি উত্তম গুণাবলী বলতে যা ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। খোদা-নির্ভরতা, চেষ্টা প্রচেষ্টা করা এবং এমন সবগুণাবলী বিলুপ্তপ্রায়। এখন খোদা তা'লা আবার সেগুলোর বীজ বপন করতে চাইছেন।'**

তৃতীয়ত, এই আয়াতে আমাদের জন্য একটি সতর্কবাণীও রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলছেন, এখন খোদা তা'লা নবরূপে সেই শক্তি বা বৈশিষ্টগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে চাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমরা যারপরনাই কৃতজ্ঞ, তিনি আমাদেরকে তাঁর সেই উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের অংশ করেছেন এবং আমরা সেই ইমামকে মেনেছি। কিন্তু আমাদের কর্ম যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রত্যাশানুরূপ না হয় তাহলে (মনে রাখতে হবে) খোদা তা'লা কারো আত্মীয় নন। (এমনটি হলে) অন্য কোন জাতি এবং

অন্য কোন মানুষ সে স্থান নেবে। উদ্দেশ্য তো অবশ্যই পূর্ণ হবে, ইনশা'ল্লাহ্, কিন্তু আমরা আবার পিছিয়ে না যাই।

এতে যে সাবধানবাণী রয়েছে তা হল, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ না রাখ এবং ধর্মকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ না কর, তাহলে পাছে শয়তান আবার তোমাদের ঘাড়ে না চেপে বসে। এজন্য সর্বদা এস্তেগফার করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে তাঁর অনুগ্রহ কামনা করতে থাক। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

'সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য শর্ত হল নিষ্ঠা। আল্লাহ্ তা'লা যেমনটি বলেছেন, 'মুখলিসীনা লাহুদ্ দ্বীন'। এই এখলাস বা নিষ্ঠা সেসব লোকের মাঝে থাকে যারা আবদাল অর্থাৎ পরিবর্তিত মানুষ বা পুণ্যবান। এসব লোক অবদাল হয়ে যান অর্থাৎ তারা আর এ জগতের মানুষ থাকেন না। তাদের প্রতিটি কাজে এক নিষ্ঠা ও যোগ্যতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়।' তিনি (আ.) বলেন, **'এটি খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো! যে ব্যক্তি খোদার হয়ে যায় খোদাও তার হয়ে যান।'**

অতএব, খোদা তা'লার (প্রিয়ভাজন) হতে হলে এবং খোদাকে আপন করে নিতে হলে আল্লাহ্ তা'লা মানব সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে এবং সেগুলো সর্বদা মেনে চলতে হবে আর সেসব আবদাল বা পরিবর্তিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যারা খোদার নির্দেশকে দৃষ্টিগোচর রাখে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ, আমি জিন্ন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার ইবাদত করে। এরপর তাঁর জন্য ধর্মকে একনিষ্ঠ করে তাঁর ইবাদত করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

'আল্লাহ্ তা'লা বলেন, জিন্ন ও ইনসানকে আমি ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। তবে হ্যা! এই ইবাদত এবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অবচিলতার সাথে দন্ডায়মান থাকা তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসা ছাড়া সম্ভব নয়। এখানে কেবল একপেশে ভালোবাসা বুঝাচ্ছে না বরং এর দ্বারা স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের ভালোবাসা বুঝানো হয়েছে। যাতে বজ্রের অগ্নির ন্যায় যা মৃত মানুষের ওপর পতিত হয় এবং যা তখন মানুষের দেহ থেকে নির্গত হয় তা (যেন) শরীয়তের (ওপর আমল সংক্রান্ত) সকল দুর্বলতাকে জ্বালিয়ে দেয় আর উভয়টি একযোগে পুরো আধ্যাত্মিক সত্ত্বাকে করায়ত্ত করে নেয়।'

তিনি (আ.) আরো বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি জিন্ন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমাকে চিনতে পারে এবং আমার ইবাদত করে।** অতএব, এ আয়াতের আলোকে মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য হল, খোদা তা'লার ইবাদত করা, তাঁর মা'রেফত অর্জন করা এবং সত্যিকার অর্থেই তাঁর হয়ে যাওয়া। এটি স্পষ্ট যে, মানুষ নিজের জীবনের লক্ষ্যে নিজেই নির্ধারণ করবে– এ যোগ্যতা সে রাখে না। কেননা মানুষ নিজের ইচ্ছায় আসে না আর নিজের ইচ্ছায় যাবেও না, বরং সে কেবল এক সৃষ্টি। কাজেই যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সব জীবজন্তুর তুলনায় তাকে উন্নত ও উত্তম শক্তিবৃত্তি দান করেছেন, তিনিই তার জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখন কোন মানুষ সেই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করুক বা না করুক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা, তাঁকে চেনা এবং তাঁর জন বিলীন হয়ে যাওয়া।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন,

'কেননা প্রকৃতিগতভাবে মানুষ খোদার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭)। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তার প্রকৃতিতে নিজের জন্য কিছু না কিছু রেখে দিয়েছেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপকরণে সজ্জিত করে তাকে নিজের

জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, তোমাদের সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য খোদা তা'লা এটি নির্ধারণ করেছেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে। কিন্তু যারা তাদের এই মূল এবং প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যকে পরিত্যাগ করে পশুর ন্যায় কেবল পানাহার ও ঘুমানোকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য মনে করে তারা খোদা তা'লার কৃপা থেকে বঞ্চিত। আর তাদের বিষয়ে খোদার কোন দায়দায়িত্ব থাকে না। দায়িত্বশীল জীবন হল, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - এর প্রতি ঈমান এনে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া। কেননা মৃত্যুর কোন ভরসা নেই। তাই তোমরা এটি ভালোভাবে জেনে রাখো, তোমাদেরকে সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ্ তা'লার একটিই উদ্দেশ্য আর তা হল, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তোমরা তাঁর হয়ে যাও। ইহজগত যেন তোমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য না হয়। এজন্য আমি বারবার এ বিষয়টি বর্ণনা করি যে, আমার দৃষ্টিতে কেবল এই একটি বিষয়ই রয়েছে যার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু (পরিতাপের বিষয় হল) এ থেকেই সে দূরে পড়ে আছে। আমি এটি চাই না যে, তোমরা জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ কর এবং স্ত্রী-সন্তানকে ছেড়ে কোন জঙ্গলে কিংবা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও। ইসলাম এগুলোকে বৈধ জ্ঞান করে না আর ইসলামের উদ্দেশ্য বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসব্রত নয়। ইসলাম মানুষকে উদ্যমী, চৌকস ও সোচ্চার বানাতে চায়। এজন্যই আমি বলি, তোমরা তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রাখ। হাদীসে এসেছে, যার কাছে জমি আছে কিন্তু সে যদি তা কাজে না লাগায় তাহলে সে জিজ্ঞাসিত হবে। কাজেই কেউ যদি এর অর্থ করে যে, জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করতে হবে তাহলে সে ভুল করে আর এর অর্থ এটি নয়। বরং মূল কথা হল, তোমরা যে ব্যবসাই কর না কেন তা যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয় এবং খোদার ইচ্ছার বাইরে গিয়ে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অগ্রগণ্য করো না। **(আল্ হাকাম, ৫ম খণ্ড, সংখ্যা ২৯, ১০ আগষ্ট, ১৯০১, পৃঃ ২)**

মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ হল, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে নফল নামায এবং যিক্‌রে এলাহী করার পদ্ধতি শেখানোর পাশাপাশি তিনি আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমষ্টিগত ইবাদত করার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যও দূরীভূত হয়ে যায় এবং ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠে।

ইবাদতের পাশাপাশি জাতির শিক্ষাদীক্ষা ও অন্যান্য বিষয়াদির প্রতিও দৃষ্টি দেয়া উচিত যেন ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে আর যেন এই প্রেরণা সঞ্চার করা যায় যে, তোমরা মসজিদে আস, একে আবাদ কর এবং ধনী–গরীব সবাই মিলে আমার ইবাদত কর। তিনি (আ.) বলেন, **'আমার ইবাদতের জন্য তোমরা যদি এভাবে পাঁচবেলা সমবেত হও তাহলে এর পুণ্যও অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে'**। এজন্য আমরা যারা এ যুগের ইমামের অনুসারী এবং তাঁর শিক্ষা মানার দাবি করি, আমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হল, কেবল মসজিদ নির্মাণ করেই আনন্দিত হলে চলবে না বরং মসজিদগুলো আবাদও করা; অন্যথায় অন্যদের সাথে আমাদের আর পার্থক্য কী? আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এভাবে বিনত হোন যেন কোন আহমদীর প্রতি কেউ অঙ্গুলি তুলতে না পারে যে, এরা মসজিদ খুব সুন্দর বানালেও নামায কমই পড়ে। বরং মানুষ যেন একথা বলতে বাধ্য হয় যে, যদি প্রকৃত ইবাদতকারী দেখতে চাও এবং রহমান খোদার এমন বান্দা দেখতে চাও যাদের কাছে শয়তান ভিড়ে না আর যারা খোদার খাতিরে বিশুদ্ধরূপে ধর্ম পালন করে তাহলে তোমরা তা প্রত্যেক আহমদী আবালবৃদ্ধবণিতার মাঝে দেখতে পাবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধাবন করার সামর্থ্য দিন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের প্রতি এত জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, যখনই নামাযের সময় হবে তখন তোমরা এটি দেখবে না যে, ওযূর পানি আছে কিনা, কাপড় পরিস্কার

আছে কিনা কিংবা এমন স্থান আছে কিনা যেখানে তোমরা নামায পড়তে পার বরং যখনই নামাযের সময় হবে নামায পড়ে নিবে। এমনকি হাদীসে এসেছে মহানবী (সা.) বলেন, আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ এবং একে পবিত্র বানানো হয়েছে। কাজেই, আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির জন্য যেখানেই নামাযের সময় হবে সেখানেই যেন সে নামায পড়ে নেয়। অতএব, প্রত্যেক আহমদীকে এ শিক্ষাই দৃষ্টিপটে রাখতে হবে।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **তাক্বওয়ার সৌন্দর্য অবলম্বন করে মসজিদগুলোতে প্রবেশ করার মাঝেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত**। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে সেসব সৎ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন ঘটা উচিত যে সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) নির্দেশ প্রদান করেছেন। একই সাথে বাহ্যিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে যত্নবান হওয়ারও নির্দেশ রয়েছে। যেমন, কাপড়-চোপড় পরিস্কার হওয়া উচিত এবং দুর্গন্ধ যেন না আসে। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, রসুন, পিঁয়াজ প্রভৃতি খেয়ে মসজিদে এসো না। কেননা পাশে দাঁড়ানো মু'মিন ব্যক্তি যে নিমগ্ন চিত্তে নামায পড়তে চায় তার নামাযে যেন ব্যাঘাত না ঘটে এবং তার মনোযোগ যেন বিনষ্ট না হয় বরং মহানবী (সা.) একথাও বলেছেন যে, এগুলো খেয়ে মসজিদের কাছেও আসবে না। কেননা যেসব জিনিসে মানুষের কষ্ট হয় তাতে ফিরিশ্তাদেরও কষ্ট হয়। তাই কাঁচা রসুন কিংবা পিঁয়াজ খেয়ে মসজিদে আসা উচিত নয়।

এরপর বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্য এবং নামাযে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার জন্য ওযূ করারও নির্দেশ রয়েছে। ওযূ করার ফলে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার পাশাপাশি মানুষ কিছুটা উদ্যমীও হয়ে ওঠে এবং (নামাযী) একাগ্রতার সাথে নামায পড়ে। বিশেষভাবে জুমুআর দিন গোসল করে (মসজিদে) যাওয়াকে পছন্দ করা হয়েছে। যাহোক, মূল উদ্দেশ্য হল, দৈহিক পবিত্রতার প্রতি যত্নবান থাকলে আত্মিক পবিত্রতার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে আর হৃদয়ে খোদা-ভীতি ও তাক্বওয়াও সৃষ্টি হবে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি। প্রথম কথা হল, মসজিদে ব্যক্তিগত কিংবা জাগতিক আলাপচারিতা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কেবল খোদার স্মরণের নিমিত্তে এসব মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে আর এদিকে আমাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত।

হযরত আমর বিন শোয়েইব (রা.) তাঁর পিতার বরাতে দাদার পক্ষ থেকে বর্ণনা করে বলেন, **'মহানবী (সা.) মসজিদের মধ্যে কবিতার আসর বসিয়ে কবিতা পড়তে নিষেধ করেছেন। আর সেখানে বসে কেনাবেচা করতে এবং জুমুআর দিন মসজিদে গোল হয়ে বসে গল্প করতেও (বারণ করেছেন)'**। (তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত)

এরপর হযরত ওয়াসেলাহ্ বিন আসকাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আরো একটি হাদীস রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'তোমরা নিজেদের ছোট শিশু, পাগলদের এবং নিজেদের ক্রয়বিক্রয় মসজিদ থেকে দূরে রাখ। নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ ও উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে মসজিদ পবিত্র রাখ। আর মসজিদকে তোমাদের শাস্তি কার্যকর করার স্থল বা তরবারি তাক করার স্থল বানিও না। আর মসজিদের দরজায় (অর্থাৎ এর নিকটে) ওযূখানা বানাও এমনকি জুমুআর দিনে (কিংবা জনসমাগম হলে) মসজিদে সুগন্ধি ছড়াও'**। (সুনানে ইবনে মাজাহ্)

কাজেই, যেসব শিশু এখনও বুঝার বয়সে উপনীত হয় নি তাদের মসজিদে নিয়ে আসা উচিত নয় কেননা, তাদের ক্রন্দনে অন্য নামাযীদের ইবাদত বিঘ্নিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামাত একটি শান্তিপূর্ণ জামাত এবং আমাদের এখানে তরবারি তাক করার কথা কল্পনাও করা যায় না। আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। কারাগারে লম্বা দাঁড়িওয়ালা মৌলভী গোছের একজন মানুষ ছিল। আমি তার সাক্ষাতকার নিতে আরম্ভ করি যে, তুমি কীভাবে এখানে এলে? সে হত্যা মামলার আসামী ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, এই হত্যাকাণ্ড

ঘটল কীভাবে? (সে বলে,) রমযান মাসে এ'তেকাফে বসেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আসে, আমার কাছে বন্দুক ছিল, আমি ফায়ার করে তাকে মেরে ফেলি। ভুলে গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে বললাম, ভুলে গুলি বেরিয়েছে? কিন্তু তুমি সেখানে বন্দুক কেন রেখেছিলে? মোটকথা তাদের এই শত্রুতা মসজিদের মধ্যেও চলতে থাকে এবং এ'তেকাফে বসেও হত্যা করাকে বৈধ জ্ঞান করে।

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে ভ্রমণ করবে তখন সেখানে কিছু পানাহারও করো'**। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই জান্নাতের বাগান বলতে কী বুঝায়? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, **'মসজিদ হল জান্নাতের বাগান'**। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আর পানাহার বলতে কী বুঝায়? তিনি (সা.) বললেন, **'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর।'**- পাঠ করা। **(তিরমিযি, কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাব হাদীসু ফী আসমাইল্লাহিল হুসনা মায়া যিকরিহা তামামা)**

মসজিদ হল জান্নাতের বাগান আর যিকরে এলাহী বা আল্লাহ্‌র স্মরণ বলতে সেখানকার খোরাক বুঝায়।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে কোন শহরের সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হল, সেখানকার মসজিদগুলো এবং সবচেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হল, সেখানকার হাট-বাজার'**। **(মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব ফযলুল্ জুলুসি ফী মিসলাহি বা'দাস্ সুবহি ওয়া ফযলুল মাসাজিদ)**

কিন্তু বর্তমানে আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন, অপছন্দনীয় জায়গাতেই মানুষ বেশি বসে আর মসজিদ যা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সর্বাধিক পছন্দনীয় স্থান সেখানে কম বসা হয় এবং সেদিকে আগ্রহ কম।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে নিজেদের মসজিদসমূহ আবাদ বা নামাযীতে পরিপূর্ণ রাখার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে।

মসজিদে কুরআন পাঠ এবং দরসের বিষয়ে বা (কুরআন হাদীস) পঠন-পাঠন সম্পর্কে হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'কোন জাতি যখন মসজিদে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ এবং পরস্পর পঠন-পাঠনের জন্য বসে তখন তাদের ওপর প্রশান্তি বর্ষিত হয়। খোদা তা'লার রহমত তাদেরকে আবৃত করে নেয় এবং ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে নিজেদের ক্রোড়ে আশ্রয় দেয়'**। **(সুনান তিরমিযী, কিতাবুল কিরাআত, বাব মা জাআ ইন্নাল্ কুরআনা আনযালা আলা সাবয়াতিন আহরুফিন)**

হযরত বুরাদাহ্ আল্ আসলামী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'অন্ধকারের মধ্যে অনেক দূর থেকে হেঁটে মসজিদে গমনকারীদের কিয়ামত দিবসে পূর্ণ জ্যোতি লাভের সুসংবাদ দাও'**।

অতএব, এর অর্থ হল, এটি বস্তুবাদিতার যুগ আর এ যুগে মসজিদ আবাদকারীরা পূর্ণ জ্যোতি প্রদত্ত হবে আর এতে এ সুসংবাদই দেয়া হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা যখন কাউকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করতে দেখবে তখন তার মু'মিন হওয়ার বিষয়ে তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করো। (কেননা) আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"মসজিদকে তারাই আবাদ করে যারা খোদা ও পরকালে বিশ্বাস রাখে"**। **(তিরমিযী, কিতাবুত্ তফসীর, তফসীর সূরা আত্ তওবা)**

উরওয়াহ্ বিন যুবায়ের তার দাদা উরওয়াহ্'র বরাতে বলেন, তার নিকট মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, রসূলে করীম (সা.) আমাদেরকে নিজেদের পাড়ায়

মসজিদ নির্মাণের এবং তা উত্তমরূপে নির্মাণের ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিতেন। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)**

অতএব, মসজিদের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অনেক বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সম্পর্কে একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'আমার সামনে আমার উম্মতের পুরস্কার বা প্রতিদান উপস্থাপন করা হয়েছে এমনকি কোন ব্যক্তি মসজিদ থেকে যে খড়কুটো বাইরে ফেলে দেয় তাও পুরস্কারের কারণ হয়।'**

মসজিদ পরিস্কারের জন্য কেউ যদি কোন খড়কুটাও তুলে বাইরে ফেলে তবে তার জন্যও প্রতিদান বা পুরস্কার দেয়া হয়।

এরপর হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কোন কষ্টদায়ক জিনিস অপসারণ করে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করবেন'**। **(সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব তাতহীরুল মাসাজিদি ওয়া তাতঈবুহা)**

অতএব এই মসজিদসহ পৃথিবীর যেখানেই আহমদীয়া জামা'তের মসজিদ রয়েছে সেগুলোর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কেবল মসজিদ বানিয়েই সারা, এরপর এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি দৃষ্টি থাকবে না– তা যেন না হয়। বরং এ বিষয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। আর আমাদের মসজিদগুলোর পরিচ্ছন্নতার মান অনেক উন্নত হওয়া উচিত। মহানবী (সা.) কখনও কখনও ময়লা চোখে পড়লে নিজেই তা পরিস্কার করতেন। কাজেই, জামাতী ব্যবস্থাপনার এদিকে অনেক বেশি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

অনেক মানুষ এমন রয়েছেন যারা ইমামের অপেক্ষায় একটু বসতে হলে কানাঘুষা করতে শুরু করে দেয় এবং বারবার ঘড়ি দেখতে থাকে। এই হাদীসটি তাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'যতক্ষণ তোমরা নামাযের জন্য অপেক্ষা করো ততক্ষণ তোমরা নামাযরত বলে পরিগণ্য হবে। আর তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ফিরিশ্তারা এই দোয়া করতে থাকে যে, হে আল্লাহ্! তুমি একে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ্! এ ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করে তুমি এর প্রতি কৃপা করো'**। **(তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত, বাব মা জাআ ফীল কুয়ুদি ফীল্ মাসজিদ...)**

এ সমাজে বসবাসরত প্রত্যেক মানুষ এর চাকচিক্যে প্রভাবিত হয়। বস্তুবাদিতার প্রতি আকর্ষণ তাকে বারবার আক্রমণ করতে থাকে। শয়তান নিজের সমস্ত শক্তি এজন্য প্রয়োগ করে যে, আমি এই ব্যক্তিকে যেভাবেই হোক কাবু করবো এবং তাকে খোদার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাব। অনেক সময় মানুষ বলে, এখন এ কাজটি রয়েছে, পার্থিব এই ছোট কাজটি করে নেই, এখনও অনেক সময় আছে– নামায পরে পড়ে নিবো। আর এভাবে সেই ব্যক্তি নিজের আধ্যাত্মিকতার রক্ষা-প্রাচীরকে দুর্বল করতে থাকে। যখন তা দুর্বল হয়ে যায় তখন শয়তান আক্রমন করে তাকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, (সে নিজেকে প্রবোধ দেয় যে) ঠিক আছে, পড়ে নিব এবং কিছুক্ষণ পর পড়ে নিবো, পরবর্তীতে দেখা যায়, সেই নামায আর পড়া হয় না কিংবা এত দ্রুত পড়া হয় যেভাবে কোন বোঝা মানুষ ঘাড় থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। অতএব, এমন অলসতা পরিহার করা উচিত। মু'মিনের হৃদয়ে সর্বদা নামাযের চিন্তা থাকা উচিত আর বর্তমান বস্তুজগতে এটিই সবচেয়ে বড় জিহাদ। হাদীসে আছে,

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'আমি কি তোমাদের সেই আমল বা কাজ সম্পর্কে অবগত করবো না– যা করার ফলে আল্লাহ্ তা'লা গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?** তিনি (সা.) বলেন, **সেটি হল, মন না চাইলেও ভালোভাবে ওযূ করা, দীর্ঘ পথ হেঁটে মসজিদে যাওয়া আর একই সাথে এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর এটিই হল রিবাত, এটি হল রিবাত এবং এরই নাম রিবাত'** (সীমান্তে ঘোড়া বেঁধে রাখা অর্থাৎ জিহাদের প্রস্তুতি)। **(সুনান আন্ নিসাঈ, কিতাবুত্ তাহারাত, বাব আল আমরু বিইসবাগিল ওযূ)**

অতএব, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক হল, সে যেন নিজের আধ্যাত্মিক সীমান্তের সুরক্ষা করে কেননা, সবাই মিলে যখন এভাবে সীমান্তের সুরক্ষা করবে, মসজিদে আসবে এবং মসজিদসমূহ আবাদ করবে তখন কোন শত্রু কখনও আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ্। আর মহানবী (সা.) আমাদেরকে এই সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, যদি এমনটি করো তবে সর্বদা সুরক্ষিত থাকবে এবং প্রত্যেক শত্রু থেকে বেঁচে থাকবে।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'বাড়িতে কিংবা বাজারে একা নামায পড়ার চেয়ে বা'জামাত নামায পড়লে পঁচিশগুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ভালোভাবে ওযূ করে এবং কেবল নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে তখন খোদা তা'লা মসজিদে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতিদানে একটি করে গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন এবং তার মর্যাদা একগুণ বৃদ্ধি করেন। মসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করে সে সময়ের পুরোটাই নামায বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য ফিরিশ্তারা এই দোয়া করতে থাকে যে, আল্লাহুম্মাগফির লাহু আল্লাহুম্মারহামহু। এই অবস্থা ততক্ষণ বিরাজ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন কাজে কিংবা কথায় ব্যস্ত না হয়ে পড়ে'**। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, বাব আস্ সালাতু ফীল মাসজিদ)**

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'আমাদের এই মসজিদে যে ব্যক্তি কল্যাণের কথা শেখার কিংবা ভালো কথা জানার অভিপ্রায়ে প্রবেশ করে, সে আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসে, সে সেই ব্যক্তির ন্যায় যে কিনা এমন জিনিস দেখে, যা হস্তগত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়'**। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫০, বৈরুত থেকে প্রকাশিত)**

মসজিদে এসে নফল নামায পড়াও পছন্দনীয় কাজ। হযরত আবু কাতাদাহ্ আল্ আসলামী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মসজিদে আসে তবে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকা'ত (নফল) নামায পড়ে'**। **(বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, বাব ইযা দাখালাল্ মাসজিদি ফালইয়ারকায়া' রাকা'তাইন)**

হযরত ফাতিমা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মসজিদে প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়তেন, আল্লাহ্র নামে এবং তাঁর রসূলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক অর্থাৎ, আল্লাহ্র নাম নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করুন অর্থাৎ এটি বলুন যে, **বিসমিল্লাহি ওয়াস্ সালামু আলা রসূলিল্লাহ্** অর্থাৎ, আল্লাহ্র নামে (প্রবেশ করছি) এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি শান্তি কামনা করছি। এরপর বল, **আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী** অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমার পাপ ক্ষমা করো। **ওয়াফতাহ্ লী আবওয়াবা রহমাতিকা** অর্থাৎ, এবং আমার জন্য তোমার আশিসের দ্বার খুলে দাও। আর মসজিদ থেকে যখন বের হবে তখন এই দোয়া পড়, **বিসমিল্লাহি ওয়াস্ সালামু আলা রসূলিল্লাহ্** অর্থাৎ, আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি) এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি শান্তি কামনা করছি। এরপর বল, **আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী** অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমার পাপ ক্ষমা করো।

ওয়াফতাহ্ লী আবওয়াবা ফাযলিকা অর্থাৎ, এবং আমার জন্য তোমার ফযল বা কৃপার দ্বার উন্মুক্ত করে দাও। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে মসজিদের আদব-কায়দা বা শিষ্টাচার সম্পর্কে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা মসজিদে করা বৈধ নয়। (১) মসজিদকে যাতায়াতের পথ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়** (অর্থাৎ দূরত্ব কমানোর জন্য এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন)। **(২) মসজিদে যেন অস্ত্র প্রদর্শন করা না হয়। (৩) মসজিদে যেন ধনুক ধরা না হয় এবং তির নিক্ষেপ করাও না হয়। (৪) কাঁচা মাংস নিয়ে মসজিদের ভেতর দিয়ে যেন না যাওয়া হয়** (কেননা এর ফলে ময়লা এবং দুর্গন্ধ উভয়ই ছড়ায়)। **(৫) মসজিদে কারো বিরুদ্ধে যেন হদ** (বা শাস্তির রায়) **শোনানো না হয় এবং কিসাস** (অর্থাৎ হত্যার পরিবর্তে হত্যার) **প্রতিশোধ না নেওয়া হয়। একইভাবে মসজিদকে যেন বাজারে পরিণত করা না হয়** (অর্থাৎ মসজিদে যেন ক্রয়বিক্রয় করা না হয়)। (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব মা ইয়াকরাহু ফীল মাসাজিদ)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রেও ধনবানদের কষ্ট হয়ে থাকে আর অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, নামাযের সময় একজন দরিদ্র ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে তার কাছে খারাপ লাগে। তাদেরকে নিজের পাশে বসাতে পারে না। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানে ব্যর্থ থাকে কেননা, মসজিদ মূলত দরিদ্রের গৃহ হয়ে থাকে।"** (মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৮, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরো বলেন, **"বর্তমানে আমাদের জামা'তের মসজিদের খুবই প্রয়োজন (কেননা) এটি আল্লাহ্‌র ঘর। যে গ্রামে কিংবা শহরে আমাদের জামাতের মসজিদ নির্মিত হয়ে গেছে ধরে নাও, সেখানে জামা'তের উন্নতির ভিত রচিত হয়ে গেছে। এমন কোন গ্রাম কিংবা শহর যদি থাকে যেখানে মুসলমান কম হয় কিংবা মোটেও না থাকে আর সেখানে ইসলামের উন্নতি চাইলে একটি মসজিদ নির্মাণ করা উচিত, তাহলে খোদা স্বয়ং সেখানে মুসলমানদের টেনে আনবেন। কিন্তু শর্ত হল, নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তে যেন মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই যেন তা নির্মাণ করা হয়। ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা কোন দুরভিসন্ধির যেন এতে ভূমিকা না থাকে। আর তখনই খোদা তা'লা বরকত দিবেন।**

মসজিদ কারুকার্য খচিত কিংবা পাকা হওয়া আবশ্যক নয় বরং জমি নির্দিষ্ট করে মসজিদের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। এরপর বাঁশ ও এ জাতীয় কিছু দিয়ে ছাত-ছানি দিয়ে দাও যেন বৃষ্টি ইত্যাদির সময় কষ্ট না হয়। আল্লাহ্ তা'লা কৃত্রিমতা পছন্দ করেন না। মহানবী (সা.)-এর মসজিদ কিছু খেজুরের ডালপালা দিয়ে তৈরি ছিল এবং এভাবেই তা চলে আসছিল। এরপর হযরত উসমান (রা.)'র যেহেতু পাকা দালানের শখ ছিল তাই তিনি নিজ খিলাফতকালে তা পাকা করেন।" [কেবল এ ধারণা নিয়ে বসে থাকা উচিত নয় যে, কাঁচা ও ছাপড়া মসজিদই নির্মাণ করতে হবে বরং পাকা মসজিদও বানানো হয়েছিল। আর আমি পূর্বেও বলেছি, মহানবী (সা.)-এর নির্মিত মসজিদকে হযরত উসমান (রা.) পাকা করেছিলেন।] হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"হযরত উসমান (রা.)'র যেহেতু পাকা দালানের শখ ছিল তাই তিনি নিজ খিলাফতকালে তা পাকা করেন। আমার মনে হয়, হযরত সুলাইমান (আ.) এবং উসমান (রা.)'র শব্দের মাঝে ছন্দের মিল থাকার কারণে সম্ভবত তিনি এসব বিষয়ে শখ রাখতেন। যাহোক, জামা'তের নিজস্ব মসজিদ হওয়া উচিত যেখানে জামা'তের ইমাম থাকবেন এবং তিনি ওয়ায-নসীহত করবেন। জামাতের লোকদের সবার সম্মিলিতভাবে সেখানে বাজামা'ত নামায পড়া উচিত। জামা'ত এবং একতার মাঝেই প্রভূত কল্যাণ নিহিত। বিক্ষিপ্তভাবে থাকার ফলে ফাঁটল ও বিভেদ দেখা দেয়। বর্তমান সময়ে ঐক্য**

ও একতার ভিত অত্যন্ত দৃঢ় করা উচিত এবং নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে এমন ছোট ছোট বিষয়াদি উপেক্ষা করা উচিত।" (আল্ বদর, ২৪ আগষ্ট, ১৯০৪; মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ডঃ, পৃঃ ৯৩)
তিনি (আ.) আরো বলেন,

"মসজিদের আসল সৌন্দর্য অট্টালিকা বা ভবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বরং সেই নামাযিদের সাথে সম্পৃক্ত যারা নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে। নতুবা দেখ! এসব মসজিদ বিরাণ পড়ে রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ছোট ছিল। খেজুরের ডালপালা দিয়ে ছাদ বানানো হয়েছিল, যা থেকে বর্ষার সময় পানি পড়তো। অতএব, মসজিদের সৌন্দর্য মুসল্লীদের ওপর নির্ভর করে। মহানবী (সা.)-এর যুগে জগতপূজারীরা একটি মসজিদ বানিয়েছিল। খোদা তা'লার নির্দেশে তা ভেঙে ফেলা হয়। সেই মসজিদের নাম ছিল, 'মসজিদে যিরার' অর্থাৎ ক্ষতিকারক ও কষ্টদায়ক মসজিদ। সেই মসজিদ ধূলিস্মাৎ করে দেয়া হয়েছিল। মসজিদের ব্যাপারে নির্দেশ হল, তাক্বওয়ার ওপর ভিত্তি করে যেন (তা) নির্মাণ করা হয়।" (আল্ বদর, ৩১ অক্টোবর, ১৯০৫; মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৯১)

আল্লাহ্ তা'লা সব আহমদীকে এই সামর্থ্য দিন, আমাদের নির্মিত প্রতিটি মসজিদ যেন খাঁটি তাক্বওয়ার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয় আর আমরা যেন সদা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারী বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হই। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হই এবং নিজের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা তাঁর সমীপেই নিবেদন করি। আর সেই খোদাকে সর্বশক্তিমান এবং সকল শক্তির আধার মনে করে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে যাই। তাঁর আদেশ ও পছন্দ অনুযায়ী যেন মসজিদসমূহ আবাদ করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই মসজিদসহ যেখানেই জামাতের মসজিদ রয়েছে তা যেন স্থান সংকুলানের দিক থেকে ছোট হয়ে যায় এবং নামাযীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। স্মরণ রাখবেন! বর্তমানে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বিজয় এই মসজিদসমূহ আবাদ করার সাথেই সম্পৃক্ত। অতএব, হে আহমদীরা! উঠো এবং মসজিদের দিকে ছুটে আস আর সেগুলো আবাদ করো, যেন ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খুব দ্রুত ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বিজয়ের দিন তোমরা দেখতে পারো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই সামর্থ্য এবং এই দিন দেখার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)